সংস্কৃতির মিলন-সেতু*

- মো: আনিসুর রহমান

১। বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ভিন্ন, কিন্তু সংস্কৃতির সেতুই মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে। ১৯৮০ সালে ফিলিপাইনে ম্যানিলা শহরে আই, এল, ওর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ শ্রমজীবীদের সমস্যার উপর একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহন করি। কর্মশালাটির প্রথম দিনের অধিবেশন পরিচালনা করেছিলেন ফিলিপিন সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় ব্যুরো অব রুনাল ওয়ার্কাসের প্রধান রাফেল এসপিরিতু। কয়েক ঘন্টা আলোচনার পর এসপিরিতু চেয়ার ছেড়ে স্টেজের সামনে এসে মাইক্রোফোন হাতে ধরে বললেন আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে উঠছে। এখন গীটারটা ধরা যাক। অবাক হয়ে দেখলাম এরকম একটি রাশভারি কর্মশালার পরিচালকের হাতে একটি স্প্যানিস গীটার চলে আসলো। এবং কর্মশালার সমস্ত সদস্যদের কাছে টাইপ করা একটি পাতা বিতরণ করা হল যাতে একটি ফিলিপিনো গান ইংরেজীতে লেখা ও তার তর্জমাও সেই সঙ্গে দেওয়া। এসপিরিতু গীটার নিয়ে গানটি ধরলেন এবং সবাইকে আহ্বান করলেন সঙ্গে গাইতে। আস্তে আস্তে উপস্থিত সকলেই আমরা তাঁর সঙ্গে গলা মিলালাম। গানটি হয়ে যাবার পর গীটারটি ফেরত গেল। এবং কর্মশালার ভারি আলোচনা আবার শুরু হলো। শুধু বাংলাদেশে কেন বহু দেশে এরকম কান্ড কল্পনা করা যায় না। সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি সিরিয়াস মানুষেরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন কোন সেমিনার বা কর্মশালায়। তার মধ্যে আলোচনা থামিয়ে গানের মতো একটি হাল্কা জিনিস নিয়ে আসা হবে, আর তাও কোন সঙ্গীত শিল্পী নয় কর্মশালার সিরিয়াস মানুষগুলোই সবাই মিলে গাইবে, এটাতো কেবল তাসের দেশেই বিদ্রোহী রাজপুত্র-সওদাগর পুত্রের দৌরাত্মে হতে পারে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মাথা হাল্কা থাকলেই তো সমাজের জটিল সমস্যাবলি বিশ্লেষণ ও আলোচনা গভীরে যেতে পারে। ডুবুরী যত relaxed থাকবে ততইতো সাগরের তলদেশে প্রবেশ করতে পারবে।

এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে যত আর্ন্তজাতিক কর্মশালায় যোগ দিয়েছি এবং যেখানেই মার খাবার ভয় না পেয়েছি প্রথমেই প্রস্তাব করেছি যে প্রতিদিন আলোচনার শুরুতেই কোন একটি দেশের প্রতিনিধিরা তাদের সংস্কৃতি থেকে একটি ছোট গান বা নাচ সবাইকে শেখাবেন এবং সকলেই সেটি একসঙ্গে কিছুক্ষণ করে তারপর সিরিয়াস আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা চলতে চলতে মাথা ভারি হয়ে গেলে আবার প্রস্তাব করেছি একটি নাচ কিংবা গান সবাইকে মিলে করা যাক। বাংলাদেশ থেকে আমার জানা গান, রবীন্দ্রনাথের গান, ডিএল রায়ের "ধনধান্য পুষ্পে ভরা", ব্রতচারীর "চল কোদাল চালাই" নৃত্য বোর্ডে লিখে দিয়ে বা সবাইকে শিখিয়ে একসঙ্গে করেছি। অন্যান্য দেশের গান ও নাচ সবাই মিলে করেছি। এতে যে শুধু মাথা হালকা হয়ে সিরিয়াস আলোচনার সহায়ক হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে একটা মমতাময় সম্পর্ক খুব তাড়াতাড়ি দানা বেঁধে উঠেছে যেটা প্রত্যেকের জীবনকে মানবিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

২। কিন্তু আরো শেখা বাকি ছিল। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে হাওয়াইয়ের হনলুলুতে ইস্টওয়েস্ট সেন্টারে একটি ১০দিন ব্যাপী কর্মশালায় যাই। বাংলাদেশীদের মধ্যে জেনেভা থেকে আমি এবং ঢাকা থেকে খুশী কবির (নিজেরা করি) এবং কাজী ফারুক (প্রশিক)া বিভিন্ন দেশ - আমেরিকা, কানাডা, নিউফাউন্ডল্যান্ড, জাপান, ফিলিপিন, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত থেকে ৪০ জনের মত বুদ্ধিজীবী, গণউন্নয়ন কর্মী এ কর্মশালায় মিলিত হন গণউন্নয়নের উপর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য আলোচনা করবার জন্য। আমি যথারীতি প্রথম দিনেই প্রস্তাব করি যে, প্রতিদিন কর্মশালার শুরুতে কোন না কোন দেশের গান বা নাচ সবাই মিলে একটু ক'রে তারপর আলোচনা শুরু হবে। প্রথম দিন হোস্ট হিসাবে হাওয়াইয়ের প্রতিনিধিদের দিয়ে এই সংস্কৃতি বিনিময় ও মন্থন শুরু হয়। পরের দিন বাংলাদেশ থেকে আমরা তিনজন "ধনধান্য পুষ্পে ভরা" গানটি প্রথম ও শেষ স্তবক বোর্ডে লিখে গিয়ে সবাইকে নিয়ে গাই। আরেক দিন রবীন্দ্রনাথের "আগুনের পরশমনি" গানটি সবাই মিলে করি। কর্মশালায় হাওয়াই থেকে একজন মহিলা ছিলেন নাম পুয়ানানী, একজন কবি ও গণউন্নয়ন কর্মী হনলুলু থেকে কিছু দূরে ওয়েআনায়ে অঞ্চলে তাদের একটি প্রকল্প ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে organic সম্পর্ক নিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টা কদরে যেখানে সকলে যৌথভাবে কাজ করবে। প্রকৃতিকে শোষন ও পীড়ন না করে তার সঙ্গে বিনিময় করবে, organic technology ব্যবহার করবে। পুয়ানানী কর্মশালার সবাইকে আমন্ত্রন জানান week end এর একদিন ওয়েআনায়েতে তাদের প্রকল্পে কাটাতে। ওয়েআনাতে যাবার আগের দিন পুয়ানানী আমাকে অনুরোধ করেন "ধনধান্য পুষ্পে ভরা" গানটি পুরোটা ইংরেজীতে লিখে প্রতিটি লাইনের তর্জমা সহ তাকে দিতে। পরের দিন ওয়েআনাতে তাদের প্রকল্পে খোলা মাঠে একটি শেডে আমরা যেয়ে পৌঁছালে পুয়ানানী সবাইকে গানটির একটি টাইপ করা কপি দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলে আমাকে বলেন, "তোমরা আমাদের ঘরে আজ অতিথি হয়ে এসেছো - এই গানটি গেয়ে প্রথমে আমাদের bless কর। নানান দেশে থেকে আগত ৪০ জনের মত অতিথি এবং ওয়েআনাতে প্রকল্পের আরো জনা পনের সদস্য, গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে "ধনধান্য পুষ্পে ভরা" গানটি গেয়ে আমাদের মিলন ঘোষনা করি।

হাওয়াইয়ের আদিমবাসীদের মধ্যে সেসময়ে একটি স্বাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধছিল। পুয়ানানী ও তার স্বামী Poka লেইনুই (বিশিষ্ট আইনজীবী, World Council for Indigenous Peoples-এর সভাপতি, আমেরিকান নাম Hayden Burgess) এই আন্দোলনের পুরোভাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দখল করবার পর হাওয়াইয়ের স্কুলসমূহে হাওয়াইয়ের নিজস্ব ভাষা শেখানো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং হাওয়াবাসীদের তাদের স্বজাতীয় নাম বদলে মার্কিন নাম গ্রহন করতে প্ররোচিত করা হয়। সত্তর দশকের শেষদিকে আদিম হাওয়াইবাসীদের স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয় প্রথমে ক্ষুদ্র আকারে; বর্তমানে এই আন্দোলন বেশ ছড়িয়ে পড়ছে। আদিম হাওয়াইবাসীরা বেসরকারী উদ্যোগে তাদের ছেলেমেয়েদের হাওয়াই ভাষা শেখাতে শুরু করে এবং তাদের সমাজের প্রবীণ-প্রবীণাদের কাছে যেয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনদর্শন, বিশ্বাস (faith) ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে।

এই গল্প করতে করতে পুয়ানানী আমাকে বলেন, "আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রকৃতির ওপর মানুষের মালিকানা করবার ধারণা ছিল না। বিদেশীরা এসে এই সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। মানুষ

কি করে ‘ভূ-স্বামী’ হতে পারে? জমি তো আমাদের অন্নদাতা, আমাদের জননী। তাই তোমাদের ‘ধনধান্য পুষ্পে ভরা’ গানটি আমাদের অভিভূত করেছে। এ যে আমাদেরই motherland-এর গান।”

আমাদের কর্মশালায় হাওয়াইয়ের স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে আলোচনাকালে একজন পুয়ানানীকে প্রশ্ন করেন, “তোমরা হাওয়াইয়ান ও নন-হাওয়াইয়ানদের মধ্যে লাইনটা ড্র করো কোথায়?”

পুয়ানানী এক মুহূর্ত চুপ করে জবাব দেন, “তুমি বোধ হয় আমার কাছে একটি racial জবাব আশা করছ। কিন্তু আমরা racial নই। আমরা তোমার হাত ছুঁয়ে বুঝতে পারি তুমি আমাদেরই একজন কি না। যদি বুঝি তুমি আমাদেরই একজন তাহলে তোমার জন্যে কোন লাইন নেই। যদি বুঝি যে তুমি আমাদের একজন নও তাহলে তোমার জন্যে লাইন আছে।

সেদিনের কর্মশালার শেষ পুয়ানানী আমাকে, খুশীকে ও ফারুককে বলেন, “তোমাদের জন্যে কোন লাইন নেই।”

আমাদের সঙ্গীত তো হাওয়াইয়ানদেরও সঙ্গীত হয়ে গেছে!

দশ দিনের কর্মশালার নবম দিনে পুয়ানানী বলেন, “তোমারা নানান দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছ, কালকে তোমরা চলে যাবে। কালকের শেষ অধিবেশনে আমরা তোমাদের হাওয়াইয়ান কায়দায় বিদায় দিতে চাই। আমরা হাওয়াইয়ানরা ফুল ও মালা খুব ভালবাসি। কালকে শেষ অধিবেশনে আমরা তিনটি মালা গাঁথব। আমি এক ঝুঁড়ি ফুল নিয়ে আসব - নানান রকম ফুল। আর আনবো একটা লম্বা সুতো। ফুলের ঝুঁড়িটা প্রত্যেকের কাছে আসবে। তোমার কাছে যখন আসবে তখন তুমি তার থেকে একটা ফুল তুলে নেবে। ফুলটা হাতে নিয়ে তোমার মনের যেকোন একটি চিন্তা প্রকাশ করবে। তারপর ফুলটা সুতোতে গেঁথে তোমার ডান পাশের সঙ্গীকে ঝুড়িটা pass করে দেবে। তারপরে তোমার বাঁ-হাত দিয়ে বাম পাশের সঙ্গীর ডান হাত ধরবে।

এইভাবে সুতোয় গাঁথা মালাটি হবে আমাদের প্রথম মালা। ফুল হাতে নিয়ে তোমরা প্রত্যেকে যে চিন্তাগুলো প্রকাশ করবে সেগুলো গেঁথে আমি একটি কবিতা রচনা করব - সেটি হবে আমদের দ্বিতীয় মালা। আর সবার পরষ্পরের হাত ধরাহয়ে গেলে সেটি হবে তৃতীয় মালা।”

পরের দিন শেষ অধিবেশনে মালা তিনটি গাঁথা হয়ে গেলে তৃতীয় মালাটির ফুল হয়ে কেউ কেউ আবেগে কেঁদে ফেলে। সবাই হাত ধরে আছি, তখন পুয়ানানী আমার দিকে তাকিয়ে বলেন,“এখন তোমরা চলে যাবে, যাবার আগে ‘motherland’ গানটি আর একবার গেয়ে আমাদের bless করে দিয়ে যাও।”

আমরা সবাই হাত ধরে থেকে একটি মালা হয়ে ‘ধনধান্য পুষ্পে ভরা’ গানটি গেয়ে কর্মশালা শেষ করি।

৩। সেই কর্মশালাটির কয়েকজন সদস্য - আমেরিকা, কানাডা, নিউফাউন্ডল্যান্ড, ভারত ও ফিলিপিন থেকে ১৯৯০ সালের মে মাসে ঢাকার অদূরে কোয়টাতে প্রশিকার ট্রেনিং সেন্টারে আর একটি ছোট কর্মশালায় মিলিত হয়। সেখানে আমি, খুশী ও ফারুকও ছিলাম। যথারীতি প্রতিদিন কোন দেশের গান বা নাচ দিয়ে কর্মশালা শুরু করি। আমরা তিনজনে বিভিন্ন দিনে কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করি বোর্ডে গানগুলো এবং তাদের অর্থ লিখে দিয়ে। সেই কর্মশালায় ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে গবেষণাতে এক মহিলা ছিলেন, নাম কেরস্টেন। তিনি হনলুলুতে ফিরে গিয়ে আমাকে একটি চিঠিতে লেখেন (বাংলায় অনুবাদ)ঃ

"আমি রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদগুলোকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। ঢাকায় ফিরে নিউমার্কেটে যেয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার চারটা অনুবাদের বই পাই ব্রাদার জেমস্‌রে। বিশেষ কর সোনার তরীটা অত্যন্ত ভাল লাগছে।

"কিছু যদি মনে না করো আমাকে আরো রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদ পাঠিও যখন পারো। আবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন হয়তো আমাকে বাংলায় দু'একটা গান শেখাতে রাজী হবে।........"

এ বছরের মার্চ মাসে ৪ সপ্তাহের জন্য আবার হনলুলুতে ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে যাই, ১৯৮৯ সালের কর্মশালাটির রিপোর্ট এবং সেই কর্মশালার সদস্যদের পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-সম্বলিত কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে একটি বইয়ের যুগ্ম সম্পাদনার কাজে। সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গোটা কুড়ি গানের ইংরেজি তর্জমা নিয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি তর্জমা শুরু করেছিলাম জেনেভায়। সেখানে প্রতি রোববারে আমরা কয়েকটি বাঙালি পরিবার একত্রিত হতাম এক সঙ্গে গান করবার জন্য - একসময় পাঞ্জাব থেকে আসা একজন পাকিস্তানী মহিলা এবং একজন কেনীয় মহিলাও আমাদের গ্রুপে যোগ দেন আমাদের সঙ্গে গান করবার জন্য, এবং তাদের জন্যে গানগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতাম। পরে আস্তে আস্তে অনুবাদগুলো লিখে ফেলতে শুরু করি।

কেরস্টেন তার কথা রাখেন এবং এক weekend-এ তার বাসায় এক রাত থেকে তাকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতে হয়। *'মধুর তোমার শেষে যে না পাই'* গানটি তিনি লিখে নেন, আমার সঙ্গে অনেকবার করেন, আমার গলায় গানটি টেপ করে নেন এবং পিয়ানোতে সুরটা তুলে নেন।

৪। কিন্তু হাওয়াইতে রবীন্দ্রনাথের আরো গভীর উপস্থিতি বাকি ছিল। পুয়ানানী আমার আগমন উপলক্ষে ওয়েআনায়েতে তাদের সেই প্রকল্পে একটি কবিতার আসরের ব্যবস্থা করেন। এক সন্ধ্যায় ওয়েআনায়ে ও হনলুলু থেকে জনা পঁচিশেক কবি একত্রিত হন। সেখানে তাদের মধ্যে হাওয়াইয়ান ও মার্কিন ছাড়া চীন, ফিলিপিন ও থাইল্যান্ড থেকেও ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে অধ্যাপনা বা পাঠরত বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রছাত্রী ছিলেন।

খোলা আকাশের নীচে চারদিকে পাহাড়ের তলায় একটি উপত্যকায় অপুর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাসের ওপরে মাদুর বিছিয়ে হ্যাসাকের আলোতে কবিতার আসর শুরু হয়। শুরুতে পুয়ানানী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ থেকে আগত তিন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে হাওয়াই ও বাংলাদেশের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। আজকে সেই তিনজনের একজন ফিরে এসেছে এই উপলক্ষে এই কবিতার আসরের উদ্বোধন। আশা করা হচ্ছে যে, এখন থেকে ধারাবাহিকবাবে এরকম কবিতার আসর চলবে যায় প্রথমটি হাওয়াই ও বাংলাদেশের মধ্যে আত্মীয়তার প্রতি উপসর্গ করা হল।

এরপরে পুয়ানানী আমাকেই বলেন একটি কবিতা পাঠ করে আসর শুরু করতে। আমি বলি যে, আমি তো কবি নই, তবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি, তার থেকে একটি পড়ে শোনাব।

হাওয়াইয়ের আকাশে মেঘের সৌন্দর্য বাংলাদেশের মেঘের সৌন্দর্যের মতই এবং ঠিক সেই সময়ে *‘দিনান্তের এই এক কোনাতে সন্ধ্যা মেঘের শেষে সোনা’*টি প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। কাব্যিক ভাষার ওপর দখল নেই বলে মার্জনা চেয়ে আমি পড়লামঃ

O lovely one,
I do not get the end of you
the hour ends,
and a mist of joy lingers all around.
in this comer of the evening,
in the last golden glow of the evening clouds,
my mind muses away,
where, O where,
without destination.

the wind rides the fragrance
of the tired evening flowers,
the body gets filled with a
body-less embrace.
in the dusty glow of the cow-dust hour
on the boundaries of the green earth
I hear, all around the woods,
the lingering of infinite music.

এরপরে আসল কবিদের কবিতা পাঠ শুরু হয়। নানান রকম কবিতা, সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনি। একটি মার্কিন মহিলার টার্ন আসলে তিনি বলেন যে, আগের রাতে তার ২০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া বোনকে স্বপ্নে দেখেন, এবং সকালে তার ওপরেই তিনি একটা কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি পড়তে পড়তে তিনি কাঁদতে শুরু করেন; কাঁদতে কাঁদতেই কবিতাটি শেষ করেন। আসরে আরও কয়েকজনও চোখ মুছতে থাকেন। কবিতাটি পাঠ শেষ হলে সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকেন, কবিতা পাঠ তখুনি আর এগোয় না।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতা ভেঙ্গে পুয়ানানী আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলেন,
“A response from Tagore?”

আমি ডায়েরী খুলে পাঠ করিঃ

when my pain brings me at your door,
you come out uncalled, open the door,
and beacon it.
it yearns for the folds of your arms
and rushes with all its drive
along the path of thorns
in love journey for thee

when my pain plays me,
I sing out at that tune,
pulled by that song you cannot stay afar
that song of mine, it swoons on the ground
like the bird of the stormy night,
and you come out, out in dark

গানটি (*“আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে”*) হনলুলু যাবার সময় প্লেনে বসে অনুবাদ করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে এটি দিয়েই ওয়েআনায়ের কবিতার আসরে তার উত্তর দেবার জন্য আমার সঙ্গে যাচ্ছিলেন তখন অবশ্য তা টের পাইনি!

কবিতার আসর শেষে রাতে শেডে একসঙ্গে পিকনিক খাবার সময় সেই বোনহারা মহিলা আমার কাছে আসেন, আস্তে শুধু বলেন, “ধন্যবাদ”।

*প্রথম প্রকাশ: *সংবাদ সাময়িকী*, ১৮ জুন ১৯৯২